সংবাদ সাময়িকী

রাজনীতি ও ছাত্র সমাজ

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

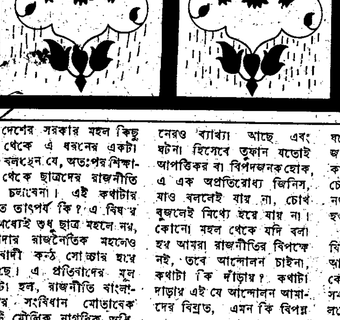

দেশের সরকার মহল কিছু দিন থেকে এ ধরনের একটা কথা বলছেন যে, অতঃপর শিক্ষাঙ্গন থেকে ছাত্রদের রাজনীতি করা চলবেনা। এই কথাটার প্রকৃত তাৎপর্য কি? এ বিষয় ইতিমধ্যেই শুধু ছাত্র মহলে নয়, পেশাদার রাজনৈতিক মহলেও প্রতিবাদী কন্ঠ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এ প্রতিবাদের মূল কথাটা হল, রাজনীতি বাংলাদেশের সংবিধান মোতাবেক একটি মৌলিক নাগরিক অধিকার। ছাত্র বলেই এ অধিকার চলে যায় না। সরকারী হুকুমে রাজনীতি করা নিষিদ্ধ করা হলে, তা হবে সংবিধান বিরোধী। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে, জেনারেল আইয়ুব খানের শাসনকালে ছাত্র কল্যাণ সম্পর্কে বিচারপতি হামুদুর রহমানের নেতৃত্বে যে কমিশন গঠিত হয়েছিল, সেই কমিশনের রিপোর্টেও এই কথা বলা হয়েছিল। কোনো অজুহাতেই ছাত্রদের রাজনৈতিক মতামত ব্যক্ত করার অধিকার খর্ব বা হরণ করা চলে না—কথাটা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছিল হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্টে।

কিন্তু আসল কথা এটা নয়। সংবিধানে কার কতোটুকু অধিকার আছে— এ কথাটা সরকার পক্ষও ভালোভাবেই জানেন। সব সময় কথা আড়াল কিছু কথা থাকে, এখানেও আছে।

আমার মনে হয়, রাজনৈতিক মত-প্রকাশের স্বাধীনতা কোনো বিতর্কিত প্রশ্ন নয়। এই স্বাধীনতার বাহ্য প্রকাশ নিয়েই যতো তর্ক। রাজনৈতিক আলোচনা, বিতর্ক এবং সময় মতো ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ নিয়ে কোনো পক্ষের কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। আপত্তির বিষয় হল আন্দোলন। রাজনীতি যদি হয় নদীর স্রোত, তবে আন্দোলনকে বলা চলে তুফান। তুফান ব্যাপারটা বিরল ও অনিয়মিত। তাই বলে অস্বাভাবিক নয়। তুফানেরও ব্যাখ্যা আছে এবং ঘটনা হিসেবে তুফান যতোই আপত্তিকর বা বিপদজনক হোক, এ এক অপ্রতিরোধ্য জিনিস, যাও বললেই যায় না, চোখ বুজলেই মিথ্যে হয়ে যায় না। কোনো মহল থেকে যদি বলা হয় আমরা রাজনীতির বিপক্ষে নই, তবে আন্দোলন চাইনা, কথাটা কি দাঁড়ায়? কথাটা দাড়ায় এই যে আন্দোলন আমাদের বিব্রত, এমন কি বিপন্ন করে, ওটা না হলেই আমরা স্বস্তিবোধ করি। আপত্তিটা রাজনীতি নিয়ে নয়, আন্দোলন নিয়ে। অবশ্য আন্দোলন রাজনীতিরই একটা রূপ।

আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি যখন রাজনীতির সুস্থ ও স্বাভাবিক রূপ প্রায় মিলিয়ে গেছে। সামরিক শাসন ও সুস্থ রাজনীতি একত্র থাকতে পারেনা। সুস্থ ও স্বাভাবিক রাজনীতি যখন মিলিয়ে গেল, এবং সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হল, তখন থেকেই মাঝে মধ্যে অনুগ্রহের দান হিসেবে পলাতক রাজনীতিকে মঞ্চে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছে, তবে তাকে স্বাধীনভাবে চলতে দেওয়া হয়নি, তাকে আড়াল থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। এ অবস্থায় রাজনীতি হঠাৎ করে যখন নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে, যখন বিশেষ পরিস্থিতিতে তার পক্ষে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে কাজ করা সম্ভব হয়নি, তখনই সে পরিণত হয়েছে আন্দোলনে। এটা বিশেষভাবে ঘটেছে তখনই যখন সরকার জনস্বার্থবিরোধী কোন কাজ করেছেন বা এমনকিছু করতে চেয়েছেন, যাতে বিপন্ন স্বাধীনতা আরও গভীরভাবে বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছে।

ছাত্র রাজনীতি ও এই বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যেই আন্দোলনমুখী হয়ে ওঠে। কেবল মাত্র ছাত্রদের নিজের সমস্যা কখনো ব্যাপক আন্দোলনের জন্ম দেয়নি, বড়োজোর স্থানীয় আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। আটষট্টি-ঊনসত্তরের ছাত্র আন্দোলন ছিল গণ-আন্দোলনেরই একটা অংশ। হতে পারে, ছাত্র সমাজ এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল এবং প্রাথমিক ভাবে একটি পরিস্থিতিকে আন্দোলনের পর্যায়ে পৌছে দিয়েছিল, যা পরে দেশের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ে। তবে পৃথকভাবে, বিচ্ছিন্নভাবে কোনো ব্যাপক আন্দোলন পরিচালনার ক্ষমতা ছাত্র সমাজের নেই।

বক্তব্যটা যখন এভাবে আসে যে, শিক্ষাঙ্গনে আর রাজনীতি চলবে না। যেহেতু এর ফলে শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে। পরীক্ষা পিছিয়ে যাচ্ছে, সেশন জট সৃষ্টি হচ্ছে। তখন এর মধ্যে পুরো সত্যটা ধরা পড়ে না এবং যা পুরো সত্য নয়, তা কখনো সত্য নয়। সুতরাং এই বক্তব্যটা অস্পষ্ট ও অযথার্থ। প্রথম কথা, আন্দোলনধর্মী ছাত্র রাজনীতির কারণটিকে গোপন করে কার্যটিকে নিন্দা করা হচ্ছে। বিনা কারণে কোনো দিন কোনো আন্দোলন হয়নি। যারা সত্য গোপন করতে চায়, তারা এটাকে অস্বীকার করে এবং কোনো কোনো সময়ে একটা মনগড়া কারণ খুঁজে বের করে। যেমন, একাত্তরের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্বন্ধে করা হয়েছিল। অনেকের মনে থাকবে, ঐ সময় সরকারী প্রচার যন্ত্র থেকে বলা হচ্ছিল, এটা অল্পসংখ্যক বিচ্ছিন্নতাবাদী ও ভারতবন্ধুদের চক্রান্ত এবং এর পিছনে মদদ জুগিয়েছে ভারত। ঘটনাটি যদি তাই হতো তবে কোনোদিন বাংলাদেশ হতো না।

কিছু স্বার্থান্বেষী লোক নেহাৎ চালাকি করে কিছু দিনের জন্য একটা উপদ্রব সৃষ্টি করতে পারে, কোনো আন্দোলনের জন্ম দিতে পারে না। বাংলাদেশের সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর কিছু দিন পরপরই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে এর কারণ প্রায় সবক্ষেত্রেই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের বাইরে, ভিতরে নয়। ভিতরের কোনো দাবীতে যখন কোনো আন্দোলন হয়, তখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ। প্রশাসন নিজেই সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে পারে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে করেও থাকে। এজন্য সরকারের কাছে সাহায্য চাইতে হয়না।

যখন আন্দোলনের উৎস ক্যাম্পাসের বাইরে, দেশের কোনো গভীর অভাব বা উদ্বেগের সঙ্গে যখন তার সম্পর্ক, তখন প্রায়ই তা কোনো একটি ক্যাম্পাসে সীমাবদ্ধ থাকেনা, কমবেশী উগ্রতার সঙ্গে সবগুলি ক্যাম্পাসেই ছড়িয়ে পড়ে। এরূপ পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিশেষ কিছু করার থাকে না। আজকাল সরকারই উদ্যোগী হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। আগুন নেভে না, তবে ছাইচাপা পড়ে কিছুদিনের জন্য।

প্রকৃত জটিলতার সৃষ্টি হয়, যখন সরকার রাজনৈতিকভাবে

সমস্যার মোকাবেলা করতে চেষ্টা করেন, নিজস্ব দল বা বাহিনীর সহায়তায়। এ ব্যাপারে প্রথম পথ প্রদর্শক ছিলেন ষাটের দশকের গভর্ণর মোনেম খান। সত্তর ও আশীর দশকে তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছেন পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সরকার। রাজনৈতিকভাবে সরকার বিরোধী আন্দোলনের মোকাবিলা করার মধ্য দিয়ে জন্মেছে এবং ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের রাজনীতি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এরূপ পরিস্থিতিতে যে কতো অসহায়, বিগত বছরগুলোতে আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি। একই সঙ্গে করুণ ও হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যখন প্রশাসন এই সঙ্কটে পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করেন। পুলিশের সাহায্যে প্রার্থনা এবং সাহায্য পাওয়া ও না-পাওয়ার বিশ্লেষণ করলে পুরো পরিস্থিতির জটিলতা ও ভয়াবহতা বেরিয়ে আসবে।

ঠিক এই ধরনের পরিস্থিতির আবর্তে পড়েছিলেন অল্প কিছু দিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন উপাচার্য। একজন তাঁর কার্যকালের অষ্টম বছরে এবং তাঁর পরবর্তীজন কার্যকালের মাঝামাঝি সময়ে, প্রায় একইভাবে পদত্যাগ করেন। যেহেতু অন্যথায় তাঁদের শারীরিকভাবে বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। বাহ্যতঃ সেই পদত্যাগ, একটু তলিয়ে দেখলে তাকে বলপ্রয়োগে বিতাড়ন বলা চলে, অন্ততঃ অনেকেই তাই বলেছেন।

এটা ঘটে তখনই, যখন প্রশাসনের সঙ্গে সরকারের অসদ্ভাব দেখা দেয়। ভিন্ন পরিস্থিতিতে, যখন একদিকে সরকার ও প্রশাসন এবং অন্যদিকে ছাত্র সমাজ, তখন সরকার এগিয়ে আসেন বিপন্ন প্রশাসনের সাহায্যে এবং প্রায় বিপন্ন ব্যক্তির উদ্ধারেরও একটা ব্যবস্থা করে থাকেন।

মোটকথা, ব্যাপক ছাত্র আন্দোলনের সময়ে যে ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল সরকার আন্দোলনের কারণ খুঁজে দেখবেন এবং সমস্যার সমাধান খুঁজবেন, সেক্ষেত্রে গণসমর্থন বর্জিত সরকার গ্রহণ করবেন নির্যাতন ও নিপীড়নের পথ। এদেশ ও সমপরিস্থিতির বিভিন্ন দেশে (যেমন, দক্ষিণ-কোরিয়া) সরকারের দৃষ্টিতে ছাত্র রাজনীতি দুষণীয়। সুতরাং দমনযোগ্য। এজন্যই যে রাজনীতির এই আন্দোলনধর্মী রূপ যে তাদের প্রতি এক ধরনের অনাস্থা, এটা তাঁরা জানেন। গণতান্ত্রিক পরিবেশে এরূপ আন্দোলনের সম্ভাবনা কমে যায় এবং বিরল ঘটনা হিসেবে কখনো যদিবা দেখা দেয়,—যেমন সাম্প্রতি ফরাসী দেশে দিয়েছিল,—সরকার দ্রুত নিজের ভুল স্বীকার করে নিয়ে পরিস্থিতিকে সামলে নিতে পারেন।

এদিক দিয়ে চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি প্রেসের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের দাবীতে যে ছাত্র আন্দোলন ঘটে গেল এবং যার মীমাংসা এখনও হয়নি, সেটা বেশ শিক্ষাপ্রদ। প্রাথমিকভাবে এই আন্দোলনের দায়ভাগ চাপিয়ে দেয়া হল কয়েকজন শিক্ষকের উপর। আবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এ ধরনের স্বীকৃতিও বেরিয়ে এল দেশের নেতাদের মুখ থেকে যে, তাঁরা ছাত্রদের সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারেন নি। শেষোক্ত স্বীকৃতি দু'দিকেই কাটে, তবু এর মধ্যে বেশ কিছুটা সততাও আছে, মানতেই হবে।

আইন করে, চোখ রাঙিয়ে যদি ছাত্র আন্দোলন বন্ধ করা সম্ভব হতো, তাহলে ঊনসত্তরেই সেটা হতো। ঊনসত্তরে যা হয়নি, সাতাশিতেও তা হবে না, প্রায় নিঃসন্দেহেই বলা যায়। গণতন্ত্রের পুনর্বাসন হলে এর প্রয়োজনও হবে না এবং এ মুহূর্তে মনে হয় এই পুনর্বাসনের জনাই ছাত্রদের, নিজেদের আশু স্বার্থ বিপন্ন করে রাজনীতির পথ ধরতে হয়েছে। অথচ সত্যিই এর কোনো প্রয়োজন ছিলো না।

রাজনীতি বা আন্দোলন, যে নামেই ডাকা হোক, ছাত্র-বিক্ষোভের বিপক্ষে সবচেয়ে বড়ো যুক্তি। এর ফলে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয় এবং আখেরে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় ছাত্র সমাজ। কথাটা ছাত্ররাও জানে, কারণ ক্ষতির দায় সামলাতে হয় ছাত্রকেই। অনেক সময় অধিকাংশ ছাত্রের অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রতিবাদ ও বর্জনের শামিল হতে হয় সকলকে। গুরুতর মতবিরোধের ফল হয় অন্তর্দ্বন্দ্ব, সংঘাত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে রক্তপাত ও প্রাণনাশ। আন্দোলনের এই সহিংস রূপ ও মারাত্মক পরিণতিও শিক্ষাঙ্গনের কোনো একক বৈশিষ্ট্য নয়। রাজনীতির ব্যাপক ক্ষেত্রেও এটা ঘটছে এবং উভয় ক্ষেত্রেই পিছনের কারণ এক ও অভিন্ন—গণতন্ত্রের পরাজয় বা পশ্চাৎপসরণ। যাঁরা এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন, তারাই যখন ছাত্রদের সদুপদেশ বিতরণ করেন, এবং রাজনীতি থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেন, তখন তা কারো মনে দাগ কাটেনা। সাধারণ বুদ্ধিতে ছাত্ররা বুঝে নিয়েছে, রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে নয় বরং সুস্থ রাজনীতিকে ফিরিয়ে এনেই হয়তো ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা ও বিরাজমান সন্ত্রাস ও সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব।

সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা বেশ কিছু দিন থেকে মারাত্মকভাবে ক্ষুন্ন হয়েছে। এটা ফিরিয়ে আনতে পারেন সরকার। এটি এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। কথা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারলেই ছাত্র সাধারণের মনে আস্থা ফিরে আসবে। গণতন্ত্র শুধু ছাত্ররাই চায়, ভাবলে ভুল হবে; গণতন্ত্র দেশের আপামর জনসাধারণের কাম্য। তবে সবাই এজন্য সমানভাবে সক্রিয় হতে পারেনা। অনুন্নত দুনিয়ার প্রায় সর্বত্রই এ দায়িত্ব পালন করেছে দেশের তরুণ সমাজ। যার একাংশ ছাত্র। ছাত্রদেরই একটি অংশ আবার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দলের হয়ে এমন কিছু কাজ করে—যা ছাত্রজীবনের বা সৎজীবনের আদর্শ বিরোধী। ছাত্ররা অনেক সময় বিভ্রান্ত হয়, বিক্রীত হয়। আশেপাশে যারা বয়সে বড়ো, তাঁদের স্বার্থপরতা, অনৈতিকতা ছাত্রদের মনে অশুভ প্রভাব বিস্তার করে। এক সর্বাত্মক নীতিহীনতার পরিবেশে বাস করে মনের নির্মলতা, আদর্শের প্রতি আনুগত্য রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় ছাত্রদের একটি অংশ। তবে এটি একটি ক্ষুদ্র অংশ। কিছু সংখ্যক বিপথগামী তরুণের ক্রিয়াকলাপের জন্য অধিকাংশ তরুণের আদর্শ ও কার্যক্রমকেই অনেক সময়ে কদর্য করা হয়ে থাকে। এতে কোনো লাভ হয়না। এক অরাজক পরিস্থিতির জন্য সর্বোচ্চ মূল্য দিয়ে চলেছে ছাত্রসমাজ। যদি যথাসময়ে এর প্রতিকার না হয়, তাহলে এই অরাজকতা শেষ পর্যন্ত আরও একটি বিস্ফোরণের জন্ম দেবে। শুধু ছাত্র সমাজকে নয়, সারা দেশকেই তখন সেই বিস্ফোরণের মূল্য দিতে হবে। ছাত্র সমাজকে উপদেশ দিয়ে কাজ হবে না, সাহস ও সততার সঙ্গে অসন্তোষের মূল কারণ সনাক্ত করে তা দূর করার আন্তরিক প্রচেষ্টাই পারে দেশকে এক মারাত্মক সঙ্কট থেকে বাঁচাতে।